

গবেষণা অভিসন্দর্ভের
সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

ভূমিকা

ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল জনজাতি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এদের ইতিহাস ক্রমাগতভাবে চর্চা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সাঁওতাল জাতির পরিচয় সংকটের মুখে, দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি বিপন্ন। অথচ তারা মনে করে সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এগিয়ে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা গর্ববোধ করলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে তাদের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অস্তিত্বের সংকট অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

অস্তিত্বের সংকট থেকেই শুরু হয় সাঁওতাল জাতির ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার, বিশেষ করে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের দিক থেকে। এরই সঙ্গে জমি ফিরে পাওয়ার চেতনাও অস্বীকার করা যায় না। কেননা ‘জমি হল সাঁওতালদের সংস্কৃতির এক ঐতিহ্য’, জমির সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্ক, যার কারণে সাঁওতাল জাতি বার বার লড়াই-প্রতিবাদ-সংগ্রাম করেছে। তারই বৃত্তান্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বিরাজমান। তাই সাঁওতাল জীবনের পরিচয় ও ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে খোঁজার প্রয়াস নিয়েই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ।

গবেষণার শিরোনামেই উল্লেখিত সময়কাল, অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত গল্প-উপন্যাসগুলিই আলোচ্য গবেষণায় আকরগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রকাশকালের সীমাবদ্ধতা থাকলেও গল্প-উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সময়কাল ও ঘটনাকালের সীমাবদ্ধতা ধরা হয়নি।

শুধুমাত্র সাঁওতাল জীবনের সামগ্রিক দিক খোঁজা নয়, জীবন সম্পর্কে লেখকের জীবনদর্শন ও বক্তব্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনদর্শন তৈরি হয় লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা, সমাজ-সভ্যতার আদিকল্প ও ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করে। সাঁওতালদের সম্বন্ধে বাঙালি লেখকদের আদিকল্প ও ইতিহাসচেতনা কীভাবে এসেছে? এর প্রাথমিক উত্তর হলো- 'সাঁওতাল বিদ্রোহের' সময় থেকেই বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে শুরু করে। এই ধারণা থেকেই বাঙালিরা সাঁওতালদের জীবনকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অন্বেষণ করেছে।

উনিশ শতক থেকেই সাঁওতাল জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। তবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তার নিদর্শন পাওয়া যায় তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ও অভিধানগুলিতে। এরই সমান্তরালে সাঁওতালদের সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব করেছেন বিদ্যাসাগর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে ইতিবাচক মনোভাবের ইঙ্গিত থাকলেও সাঁওতালদের জীবন নিয়ে বিস্তারিত রচনা পাওয়া যায়নি। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে।

আলোচ্য গবেষণায় স্বাধীনতা উত্তরপর্ব বেছে নেওয়ার কারণ দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যার প্রভাব আদিবাসী সমাজেও পড়ে, সেই সঙ্গে আদিবাসীদের জমি সংকট দেখা যায়। একই সময়ে ভারতে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলো, আদিবাসীরাও স্বাধীন হলো, তারাও ভাবল সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করল। আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদেরই থাকবে। অন্য কোনো জাতি জমি কিনতে পারবে না। যা স্বাধীনতার পরে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে কতটা, তার প্রমাণ ইতিহাসে কিছুটা থাকলেও সব কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে গল্প-

উপন্যাসের পাতায়। ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন’ শিরোনামে গবেষণার পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে-

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন (১৯৪৭-২০১৫)

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন (১৯৪৭-২০১৫)

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সাঁওতালদের পরিচয় ও সংস্কৃতির নানা দিক। অর্থাৎ সাঁওতালরা আসলে কারা? কোন জাতি বা সম্প্রদায়? এদেরকে কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের জীবন ধারণের বৈশিষ্ট্য কীরকম? স্বাধীনতা উত্তরকালে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষাগত দিক থেকে ‘সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি’ অনুসন্ধান করাই এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। গল্প-উপন্যাস আলোচনার করার জন্য সাঁওতাল জীবনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে অধ্যায়টি রাখা হয়েছে।

ভারতে বহু আদিবাসীর বসবাস, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতাল জনজাতি। বর্তমানে সাঁওতাল জাতি মূলত বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল ও বাংলাদেশে। বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কম-বেশি সমান। সাঁওতালদের রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং

নিত্যদিনের জীবনযাপনের ধরন প্রায় একই। শুধুমাত্র স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন। এই স্থান-কালের নিয়মেই সাঁওতাল জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তারতম্য দেখা যায়। সেই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিও বিশেষভাবে পরিবর্তনীয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে অবস্থিত সাঁওতালদের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক নিয়মকানুনও লক্ষ করা যায়। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজের প্রভেদও লক্ষ করা যায়।

সাঁওতালদের মোট বারোটি গোত্র, যথা- হাঁসদা, কিস্কু, হেমব্রম, টুডু, মার্ভি, মুর্মু, চঁড়ে, সরেন, বাস্কে, বেদেয়া, পাঁউরিয়া ও বেসরা। আদিমকাল থেকেই সাঁওতালরা গোত্র সম্পর্কে খুবই রক্ষণশীল। গোত্র বিভাজনের মতোই শক্তিশালী এদের সামাজিক সংগঠন। সাঁওতাল সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নাইয়কে, পারানিক, মাঝি ও দিশম মাঝির হাতে। মাঝি বাবার হাতেই গ্রামের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থাকে। আর নাইকে বাবার হাত দিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা হয়। পিলচু হাড়াম, পিলচু বুড়ি, সিঞ চান্দো, নিন্দা চান্দো, মারাং বুরু, জম সিম, জাহের থান, গোসাই এরা- প্রভৃতি দেব-দেবী গ্রামের মানুষ খুব যত্ন সহকারে সেবা করে। বস্তুত তাদের মূল বিশ্বাস বোঙ্গাদের ওপর। বোঙ্গাদের পূজা করেই গ্রামের পাঁচজন মিলে আয়োজন করে সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিক বিবাহ, টুঙকি দিপিল বাপলা, অর আদের বাপলা, ঐঃর বল বাপলা, ইতুৎ সিন্দুর বাপলা, সাজা বাপলা, কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা প্রভৃতি বিবাহ সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত। গ্রামে মোড়লের নির্দেশে সাঁওতালদের উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় বছরব্যাপী। যেমন 'এরক সিম বোঙ্গা', 'হারিয়াড় সিম বোঙ্গা', 'জাহাড়', 'সহরায়', 'বাহা', 'নাওয়াই', 'দাঁসায়', 'কারাম', 'মাঃ মড়ে,' 'শিকার পরব'- বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান তাদের সমাজে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা

এই গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা' আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক-আধুনিক যুগ থেকেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ 'দামিনী-কো' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে নানা কারণে। তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'দামিনী-কো' ও 'সাওরিয়া' পাহাড় অঞ্চলে 'অরণ্য আইন'(১৮৬৪), 'সরকারী জঙ্গলের সীমা নির্ধারণ'(১৮৭১), 'সংরক্ষিত অঞ্চল'(১৮৯৮), 'ডেপুটি কমিশনার জঙ্গল'(১৯০৬), 'সরকারী জঙ্গলে সীমা বৃদ্ধি'(১৯১০)- ইত্যাদি আইন প্রয়োগ করে, তার ফলে আদিবাসী সাঁওতাল জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে এবং তারা সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা বেঁচে থাকার তাগিদে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, 'বাবা তিলকা মাঝির লড়াই'(১৭৮৩-৮৪), 'ভূমিজ বিদ্রোহ'(১৭৯৮), 'চুয়ার বিদ্রোহ'(১৭৯৯), 'ভুকান সিং-এর বিদ্রোহ'(১৮১০), 'মুগা বিদ্রোহ'(১৮১৯-২০), 'কোল বিদ্রোহ'(১৮৩৩), 'ভূমিজ বিদ্রোহ'(১৮৩৪), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'(১৮৫৫), 'সরদার আন্দোলন'(১৮৫৭-৯৫), 'খেরোয়াড় আন্দোলন'(১৮৭৪-৭৫), বীরসা মুণ্ডার 'উলগুলান'(১৮৯৯-১৯০০) এর মতো লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন, দাঙ্গা ও যুদ্ধ হয়েছে ক্রমাগত, যার ফলে মানুষ ছন্নছাড়া হয়ে সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তরযাত্রার চিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে বৈচিত্র্যময়ভাবে উঠে এসেছে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র ও ভাষা ব্যবহার যেমন উপস্থিত থাকে, তেমনি থাকে এক বিশাল দেশকালের প্রেক্ষাপট। সেই দেশকালের প্রেক্ষাপটে সাঁওতালদের দেশান্তর যাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকদের জীবন দর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে। লেখক যখন বিশেষ কোনো ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত মানুষের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেন তখন সেই ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর অবস্থিত মানুষের অতীত পরিচয় অন্বেষণ করা খুব

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। মানুষের অতীত পরিচয়ে লুকিয়ে রয়েছে স্থানান্তরিত আত্মকথা। যে আত্মকথার মূলে রয়েছে সাঁওতাল সমাজের ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের পরিচয় প্রমাণ করে সাঁওতাল জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন (১৯৪৭-২০১৫)

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত উপন্যাসগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেই উপন্যাসের প্রকাশকাল অনুসারে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এতে করে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের দিকগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূলে কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য-কুহেলী’(১৩৫৬), সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’(১৯৫৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সপ্তপদী’(১৯৫৮), ‘অরণ্য-বহ্নি’(১৯৬৬), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চতপা’(১৯৫৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’(১৯৬৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘তৃণভূমি’(১৯৭০), আব্দুল জব্বারের ‘মাতালের হাট’(১৯৭২), মহাশ্বেতা দেবীর ‘অক্লান্ত কৌরব’(১৯৮০), ‘সিধু কানুর ডাকে’ (১৯৮১), ‘শালগিরার ডাকে’ (১৯৮২), অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ (১৯৮৫), মানব চক্রবর্তীর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’ (১৯৯৪), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহলবনীর সেরেঞ’(১৯৯৫), ‘দ্বৈরথ’ (২০১৪), ভগীরথ মিশ্রের ‘জানগুরু’(১৯৯৫), নলিনী বেরার ‘শাল মহলের প্রেম’ ও ‘দুই ভুবন’- উপন্যাসগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে সাঁওতালদের বৈচিত্র্যময় জীবন দেখতে পাবো। স্বাধীনতা উত্তর সাঁওতালদের লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে দিকুদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর ফলে সাঁওতালদের জোট নষ্ট হয়। বাঙালি ও সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যে মেলবন্ধনের ছবি যেমন রয়েছে, তেমনি উভয় জাতির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বও উঠে এসেছে। বাঙালি ও সাঁওতাল জাতির

मध्ये ये आन्तःसम्पर्क गড়ে उठेछे ता आसले राजनीति ओ अर्थनैतिक कारणे। दिकुदेर गण-आन्दोलनेर प्रभावे साँओताल समाजे खुनोखुनिर राजनीति बड़ हये उठेछे। यार प्रमाण रयेछे नकशाल आन्दोलने, बाड़खणु आन्दोलने किंवा माओवादी आन्दोलने। सिधु-कानु-विरसा मुण्ठर परे आदिवासी समाजे एकमात्रे शिवु सोरनेनेइ सम्मान श्रद्धा पेयेछिलेन। किन्तु दिकुदेर सङ्गे योगदान कराइ ताँर मुख्ये भूल छिल। एइ समस्त घटना 'मातालेर हाट' उपन्यासेर रवि चरित्रेर मध्ये पाओया यय।

शुधुमात्रे समसामयिक घटना नय साँओतालदेर अतीत इतिहास नियेओ चर्चा हयेछे, सेखाने देखा यय बाबा तिलका मावि लड़ाइ, सिधु-कानुर लड़ाइयेर मतो नानान आन्दोलन। लड़ाइ-संग्रामे शुधुमात्रे पुरुषराइ योगदान करेनि, नारीराओ एगिये एसेछे। साँओताल नारीदेर विद्रोहिनी सत्ता देखानो हयेछे। फुलो वानोर मतोइ देखते पाय रुकनी, टुकनी, मानकी, भैरवी, दुलाली, दौपदीर मतो विद्रोहिनी नारी। ताराशङ्कर बन्द्योपाध्यायेर 'अरण्य-बहू' उपन्यासेर रुकनी, टुकनी, मानकी, भैरवी, कालिपद घटकेर 'अरण्य-कुहेली' उपन्यासेर दुलाली, आबुल जबरारेर 'मातालेर हाट' उपन्यासेर पियाली, रूपा- प्रभृति चरित्रेर निदर्शन पाओया यय। शुधु इंगरेज किंवा दिकु चरित्रे नय, आबुल जबरारेर 'मातालेर हाट' उपन्यासेर नेता चरण बेसरार मतो साँओताल चरित्रेराओ उपभोग करेछे मेयेदेर यौनता। किंवा सैयद मुस्तफा सिराजेर 'तृणभूमि' उपन्यासेर विपिन मास्टारओ शासन करेछे बुमरीर मतो निरीह नारीके। नारीरा ये धरिषित हछे तरइ विरुद्धे साँओताल समाज वारे वारे प्रतिवाद, लड़ाइ, आन्दोलन करेछे।

साँओताल जीवन गौष्ठीभित्तिक। फलत तादेर संस्कृति अतीत ऐतिह्ये ग्रथित। बहुकाल पर्यन्त अरण्यवासी एइ आदिम जनगौष्ठी श्रुतिपरम्पराय तादेर ऐतिह्य ओ संस्कृतिर अभिज्ञान बहन करे चलेछे। तवे एकेवारे अ-परिवर्तनशील नय एइ परम्परा। साँओतालदेर निजस्य

ধর্ম রয়েছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে সাঁওতালরা নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে পারছে না। খ্রিস্টানে ধর্মে ধমাস্তরিত হয়েছে। আবার তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও দেখা যায়। এখানেও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন রয়ে যায়।

সাঁওতালদের প্রাচীন বিশ্বাস হলো ডাইনি প্রথা, এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সপ্তপদী’ উপন্যাসের ঝুমকি কিংবা ভগীরথ মিশ্রের ‘জানগুরু’ উপন্যাসে ফুলমুণি চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। রক্ষণশীল সাঁওতাল সমাজের বিধির বিধানকে উপেক্ষা করা সহজ নয়, এর ফলে সাঁওতাল সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করেছে। সালিশিসভার প্রতি এদের যে বিশ্বাস ছিল, তা ক্রমশ কমে যায় রক্ষণশীলতার কারণে। তার নিদর্শন পাওয়া যায় কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য-কুহেলী’ উপন্যাসে।

অনেক উপন্যাসেই শিক্ষিত সাঁওতাল চরিত্রের কথা পাওয়া যায়। শিক্ষিত সাঁওতাল মানুষ আদিবাসী সমাজের কথা ভেবে কাজও করেছে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহলবনী সেরেঞ’ উপন্যাসে সনাতন, মহাশ্বেতা দেবীর ‘অক্লান্ত কৌরব’ উপন্যাসের দিলীপ সোরেন, আব্দুল জাব্বারের ‘মাতালের হাট’ উপন্যাসের রবি হাঁসদা- প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সাঁওতালদের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। আবার অনেকেই শিক্ষা লাভের পর কিংবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পাওয়ার পর আদিবাসী সমাজ থেকে দূরে সরে থেকেছে। এধারায় ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসের বিপিন মাস্টার ও ‘মাতালের হাট’ উপন্যাসের চরণ বেসরার মতো প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন (১৯৪৭-২০১৫)

স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা ছোটগল্পে নির্জন স্নিগ্ধ পরিবেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাঁওতালদের সংগ্রাম কিংবা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে নেই, বরং বন-জঙ্গলে অবস্থিত সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের কাহিনি ছোটো ছোটো গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির আমলে মিশনারি ইংরেজদের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক কীরকমের ছিল? সেই জটিল সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে আলোকপাত করা হয়েছে। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমল মাঝির গল্প’ কিংবা ‘একটি প্রেমের গল্প’ গল্পদুটিতে সাঁওতাল সমাজের অভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল জাতি আধুনিক শিক্ষায় কতটা শিক্ষিত হয়ে উঠছে, সাঁওতাল গ্রামগুলিতে শিক্ষার আলো কতখানি প্রবেশ করছে, তা বুঝবার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালচিত্তি’ গল্প। সাঁওতালদের জীবন যে অন্যের শাসনে পরিচালিত হয় তার নির্দশন পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের ‘শিকারী’ গল্পে। আবার ভিন্ন জাতির কাছ থেকে সাঁওতালরা সং পরামর্শ পেতে পারে তার উদাহরণ পাওয়া যায় কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’(১৩৫৯) গল্পে। তাঁর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে মানুষের লোভ-লালসার চিত্র কতটা ভয়ংকররূপ ধারণ করতে পারে, তা গল্প বলার কৌশল ও চরিত্র নির্মাণ থেকে বোঝা যায়। রমাপদ চৌধুরী বাস্তব ও মিথের পরম্পরাকে কীভাবে রক্ষা করেছেন? তা তাঁর ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্পে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর ‘নারীরত্ন’ গল্প এধারার ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। গল্পে নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিল দিকগুলি ধরা পড়েছে।

সত্তর দশকের ব্যতিক্রমী লেখিকা হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত চারটি বিশেষ গল্পের নাম হলো ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘দ্রৌপদী’, ‘জল’ এবং ‘এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ’। এই গল্পগুলিতে লেখিকা সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘটনাকে রাজনৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। সত্তর দশকের আর এক কথাসাহিত্যিক হলেন নলিনী বেরা, তাঁর ‘ঝাঁটার কাঠি’ ‘খোরপোষ’ ‘ঘবা, তিহা-র গল্প’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে সাঁওতালদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ও সামাজিক মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণের দিকগুলি বেশি করে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যিক নলিনীর বেরার গল্প

আলোচনা করতে গেলেই সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের প্রসঙ্গ চলে আসে। আসলে এঁরা একই সময়ের লেখক। সৈকত রক্ষিতের ‘ছল’ ‘যশোমণি মুর্খু’, ‘রাঙামাটি’, ‘মাড়াই কল’ গল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা, বেদনা, কষ্ট পরিব্যপ্ত হয়েছে।

উপসংহার:

গল্প-উপন্যাস মিলেই কথাসাহিত্য। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিরাট এক ন্যারেটিভ থাকে কথাসাহিত্যে, যাকে বলে জীবনের বিন্যাস। কথাসাহিত্যের জীবন বিন্যাস তৈরি হয় বাস্তব জীবন থেকে। একটা জাতির জীবন নিয়ে একজন লেখকের আখ্যান যতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, তাঁর থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে একটা জাতির জীবন নিয়ে বহু লেখকের বহুমাত্রিক রচনায়। দশকের পর দশক যখন সাঁওতাল জীবনের বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় তখন তা সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাঁওতাল জীবনের প্রতিবাদ-লড়াই-সংগ্রাম, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির চিন্তা-চেতনার ধারাবাহিক ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে সাঁওতাল জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙালি লেখকদের ক্রমাগত চিন্তাধারাগুলি উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্ত হয়ে উঠেছে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়।